সূচিপত্র

কেন শিশুকে বইমুখী করবেন?	**৯**
শিশুকে বইমুখী করে তোলার উপায়	**১৪**
প্রধান লক্ষ্য : পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা	১৪
সময় শেষ হয়ে যায়নি	১৫
উপযুক্ত সময়	১৬
বুঝতে পারার গুরুত্ব	১৯
পড়াশোনায় যদি আসে অনিয়ম	২০
স্বতঃস্ফূর্তির সাথে পড়ে শোনানো	২০
ছোটরা ভাষণ শুনতে ভীষণ অপছন্দ করে	২০
টিভি আর ইউটিউব বইয়ের শত্রু	২২
অস্থিরতা এবং পড়াশোনা	২৩
শিশুদের সাথে সত্যবাদিতা	২৪
পড়ার ধরন যেমন হবে	২৫
বইবান্ধব পরিবেশ	**২৮**
পারিবারিক পরিবেশ	২৯
স্কুলের পরিবেশ	৩৯

পাঠাভ্যাস তৈরির পথ ও পদ্ধতি **৪৫**
মেধার বিকাশে গল্পের ভূমিকা **৫৯**
শিশুদের কেন গল্প শোনাব? ৬০
গল্পের মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞান দান ৬১
গল্পচ্ছলে ন্যায়-নীতি ও মূল্যবোধ শিক্ষা ৬২
গল্পের মাধ্যমে চিন্তার বিকাশ ৬৪
গল্পের মাধ্যমে সামাজিক সতর্কতা বৃদ্ধি ৬৭
গল্প কি বলব নাকি পড়ে শোনাব? ৬৯
ঘুমানোর আগে গল্প বলা **৭১**
ভালো গল্পের মাপকাঠি ৭৩
কিছু ভালো গল্পের বৈশিষ্ট্য ৭৩
কিশোরদের প্রতি আহ্বান **৮১**
কিশোরদের উৎসাহ জাগাতে কিছু পরামর্শ ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুকে বইমুখী করে তোলার উপায়

আমরা চাইলে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখি, সে সুযোগ আমাদের আছে। কিন্তু সেগুলোর কোনোটিই সারাজীবনের জন্য নয়। সবাইকেই যার যার করণীয় নির্বাচন করতে হবে। প্রাধান্য অনুযায়ী আগ্রহ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আর পড়া প্রসঙ্গে মূলকথা এখানেই। শিশুদের মাঝে পড়ার অভ্যাস গড়ার জন্য চেষ্টা, সময় এবং ধৈর্য প্রয়োজন। বাবা-মাকে সময় ব্যয় করতে হবে এর পেছনে। কখনোই হাল ছাড়া যাবে না। আর এই অসামান্য প্রচেষ্টার মূল্যও তাদের অনুধাবন করতে হবে। একটু তাকালেই দেখা যাবে, আশেপাশের কত পরিবার এই কাজে ব্যর্থ হয়েছে। শিশুর কাছে পড়াকে প্রিয় করে তোলার জন্য তারা সময় দেয়নি। এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তারা জানে না। অসংখ্য ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তিকর চিন্তা তারা লালন করে বেড়াচ্ছে। আর এগুলো নির্মূলের লক্ষ্যেই মূলত এই বইটি লেখা। নতুন করে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু নিয়ম-নীতির বাস্তবায়ন অতি জরুরি।

প্রধান লক্ষ্য : পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা

শিশুর জীবনে পড়ার সুফল সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কখনোই তাকে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না। এটিকে শিশুর অভ্যাসে পরিণত করা থেকে তাদের কেউ আটকাতে পারবে না। অধ্যয়ন এবং জ্ঞানার্জনকে সাধারণত সবাই কল্যাণকর মনে করে। প্রতিটি সচেতন অভিভাবক তাই তার সন্তানকে পড়তে

উৎসাহিত করে থাকেন, ভালো ভালো বইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তবে অধিকাংশ মা-বাবাই শিশুর পড়ার পেছনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকেন না। এর অজস্র উদাহরণ রয়েছে।

তাই শিক্ষক হিসেবে একজন অভিভাবককে পর্যায়ক্রমে এবং সুনির্দিষ্ট পন্থায় শিশুর কাছে পড়াকে প্রিয় করে তুলতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আমরা চাওয়ামাত্রই একজন শিশু তার ভালো-মন্দ বুঝে ফেলবে না। আর খুব সহজেই শিশুর মনোযোগ ছুটে যেতে পারে। একজন বাবার কথা জানি। উপার্জন কম হওয়ায় অনেক কষ্টে দিনযাপন করতে হতো তাকে। এর জন্য তিনি নিরক্ষরতাকে দায়ী করতেন। দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য সবকিছু ছিল তার অশিক্ষিত হওয়ার ফলাফল। এজন্য তিনি জীবন দিয়ে হলেও একমাত্র সন্তানকে দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বানানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। মসজিদের পাঠাগার থেকে কোন বইটি ছেলেকে পড়তে দেওয়া যায়, এই ব্যাপারে তিনি ইমাম সাহেবের শরণাপন্ন হলেন। বাড়ির পাশের মক্তবের উস্তাযকে অনুরোধ করলেন তার সন্তানের জন্য কিছু গল্পের বই কিনে দিতে। বাড়িতে কোনো বন্ধু তার মেধাবী সন্তানকে নিয়ে উপস্থিত হলে তার সাথে নিজের সন্তানকে খেলতে পাঠাতেন। বন্ধুর সন্তানকে বলতেন, সে যেন পছন্দের কিছু বই তার ছেলেকে পড়তে দেয়। স্কুলে গিয়ে তিনি সন্তানের শিক্ষকদের খোঁজ নিতেন। সন্তানের অগ্রগতির ব্যাপারে তার চেয়ে আগ্রহী আর কেউ ছিল না। সর্বোপরি একজন তুখোড় ছাত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার বাবা প্রচুর শ্রম দিতেন। অবশেষে তিনি সফল হয়েছেন। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আশেপাশের সবাই তাকে সম্মান করতে শুরু করল। সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে (পরামর্শ নিতে) সকলে তার শরণাপন্ন হতে লাগল!

নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ এবং অধ্যবসায়ের ফলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। আর শিশুদেরকে বইপ্রেমী করে তুলতে চাইলে মূলত এটিই প্রয়োজন।

সময় শেষ হয়ে যায়নি

যত তাড়াতাড়ি শিশুকে পড়তে শেখানো এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু অনেকেই এই ব্যাপারটি সময় গড়িয়ে গেলে উপলব্ধি করে। আবার পরিস্থিতির কারণে প্রচেষ্টার পরেও শিশু সময়মতো সাড়া না-ও দিতে পারে।

যা-ই হোক, শিশুর মাঝে পড়ার আগ্রহ তৈরির সময়টা ফুরিয়ে যায়নি। অনেক শিশু মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে গিয়ে অধ্যয়নের মর্ম বুঝতে পারে। এমনকি অনেকে ত্রিশ বা চল্লিশে পা দিয়ে বইপড়ার স্বাদ খুঁজে পায়। মূলকথা হলো, হাল ছাড়া যাবে না। শিশুকে তাগিদ দেওয়া বন্ধ করা যাবে না। কোন জিনিসটা তাকে পড়া থেকে বিরত রাখছে, সেটার প্রতি সূক্ষ্ম নজর রাখতে হবে।

ভুলপন্থা অবলম্বনের ফলে শিশু পড়ার প্রতি উৎসাহী হবার বদলে আগ্রহ খুইয়ে বসে। আবার পদ্ধতি সঠিক হবার পরেও অনেক পরিবার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পায় না। শিশুর শিক্ষক তার পড়ার প্রতি আগ্রহ হারানোর কারণ হতে পারে। বন্ধুবান্ধবের কারণেও এমনটি হওয়া সম্ভব। আবার হতে পারে শিশুর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা পরিবারের কেউই তা জানে না।

তাই শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনার সঠিক পন্থাগুলো খুঁজে পেতে আমাদের সতর্ক হতে হবে। পাশাপাশি সফলতা লাভের জন্য দুআ করতে হবে মন থেকে।

উপযুক্ত সময়

শিশুর মাঝে জ্ঞানের সমাহার এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তাকে প্রস্তুত করতে চাইলে তা শুরু করতে হবে খুব অল্প বয়স থেকেই। পড়ার প্রতি সুসম্পর্ক স্থাপনও এই সময়টিতেই করতে হবে। এমনকি গর্ভের শিশুকেও যদি কোনো কিছু পাঠ করে শোনানো যায় তাহলে সে তা থেকে উপকৃত হয়। এ কথা বিজ্ঞানীরা বলছে।

জরিপে দেখা গেছে, ৭ মাস বয়স থেকে শিশুকে নিয়মিত কিছু পড়ে শোনালে তা সে ধরার চেষ্টা করে। ঘটনাটি কানাডায় ঘটেছে—একটি পার্কে গাছের সাথে হেলান দিয়ে একজন মহিলা বই পড়ছিল জোরে জোরে। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে জানাল, 'আমার গর্ভের সন্তানকে পড়ে শোনাচ্ছি!'

পড়াকে প্রিয় করার বন্দোবস্ত শিশুর জন্মের আগে থেকেই শুরু করতে হয় এবং এভাবে পরবর্তীকালেও চলতে থাকে।

সবার আগে শিশুকে শুধু পড়ে শোনাতে হবে এবং গল্প বলতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে গল্পের দৈর্ঘ্য আর গভীরতা বাড়াতে হবে।

কিছু কৌশল

» একদম বাচ্চা অবস্থায় শিশুকে দুয়েক মিনিটের গল্প শোনালে ভালো হয়। নির্দিষ্ট ছন্দ এবং ছোট বাক্যের গল্পগুলো অধিক উপযুক্ত। অথবা মা চাইলে শিশুকে ছড়া পড়ে শোনাতে পারেন। শিশু কান্নাকাটি করলে বা ঘুমোনোর সময় কিংবা শুধু আনন্দের জন্যও সব মা-ই এমনটা করে থাকেন। তবে গল্প ও ছড়ায় প্রতিদিন ভিন্নতা আনা উচিত।

এটি প্রমাণিত যে, শিশু এই অবস্থায় অনেক কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এতে সে আনন্দ পায়।

আমরা তো কথা বলার সময় একে অপরকে থামিয়ে দিই কিংবা ছোট ছোট কারণে যা বলতে চাই তা ভুলে যাই। এই ব্যাপারগুলো এড়াতে গল্প এবং ছড়াগানগুলো বেশ কাজের। কারণ তা শিশুর শ্রবণশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

» শিশুর বয়স ৩ বছর হয়ে গেলে তাকে গল্প বা বই পড়ে শোনানোর সময় পাঁচ মিনিটে উন্নীত করতে হবে। এর বেশি করা যাবে না। কারণ শিশুর মনোযোগ ধরে রাখার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে।

এ ছাড়া এ সময়ে বলা গল্পগুলোর বিষয়বস্তু তার পরিচিতির ভেতরে থাকতে হবে। এতে করে যা বলা হচ্ছে তা সে অনুধাবন করতে পারবে।

মা তার শিশুকে বলতে পারেন যে, তাকে সবদিক দিয়ে ভালো রাখার জন্য তিনি সারাক্ষণ চিন্তায় থাকেন। বাবা তাকে অনেক ভালোবাসেন, তিনি তার জন্য মিষ্টি নিয়ে আসবেন। তার বড় ভাইও পছন্দের জিনিস এনে দেবে। এরপর বিভিন্ন পোষাপ্রাণীর কথা এবং তাদের প্রতি দয়া দেখানো ও খাবার দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। আবার গল্প বলার সময় মা যদি বুঝতে পারেন যে, শিশু তা পছন্দ করছে এবং অন্য গল্পের তুলনায় এটি তাকে অধিক ছুঁয়ে যাচ্ছে তবে সেটি যেন বারবার তাকে শোনানো হয়। কিছু গল্প ও ছড়া শিশুদের কাছে অন্যগুলোর চেয়ে বেশি প্রিয় হয়। সেগুলো শোনার জন্য সে বারবার বায়না ধরে। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণটি জানা না গেলেও শিশুর চাহিদা পূরণে কোনো ক্ষতি নেই।

শিশু পাঁচে পা রাখার পর সহজেই বুঝতে ও শুনতে পারে। তাই মা এবার গল্পের পরিধি ১০ মিনিটে উন্নীত করতে পারেন। কিন্তু এটিও মাথায় রাখতে হবে যে,

শিশুদের ধৈর্য ওঠা-নামা করে। এজন্য তাদের প্রতি নজর রাখতে হবে। কোনোরকম বিরক্তি কিংবা অনাগ্রহ দেখামাত্রই মা যেন গল্প শেষ করে দেন।

মানুষের মতো কথা বলতে পারে, এমন পশুপাখিদের গল্প ও উপকথা পছন্দ করে এ বয়সের শিশুরা। দৈনন্দিন জীবনের গল্পও তাদের পছন্দের বিষয়বস্তু।

একজন দাদি তার নাতি-নাতনিদের এক কিশোর বালকের গল্প শোনাচ্ছিলেন—ছেলেটি মন দিয়ে আগামীকালের পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করেছিল। কিন্তু রাত জাগার কারণে সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে পারল না। স্কুলে যেতে যেতে তার অনেক দেরি হয়ে গেল। পরীক্ষার জন্য ভালো একটি প্রস্তুতি থাকার পরও সে একটি বিষয়ে খারাপ করল। এরপর দাদি তার নাতি-নাতনিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এমনটি যাতে না হয় সেজন্য কী করতে হবে?' তারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি ঘুমোতে হবে।' তবে যে গল্পটি তাদের সবচেয়ে ভালো লাগল তা ছিল বাবার পকেট থেকে ছেলের টাকাচুরির ঘটনা। বেশ বড় রকমের অর্থ সে গোপন করে পাশের মাঠে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু পরে তা উদ্ধার করতে গিয়ে আর খুঁজে পেল না। অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিস আত্মসাৎ করা যে কতটা মন্দ তা দাদি বুঝিয়ে দিলেন। আর এদিকে ওই বালকের ব্যর্থতায় শিশুরা যারপরনাই আনন্দিত হলো।

» শিশুর বয়স ৬ পার হয়ে গেলে গল্পের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ১৫ মিনিট করা যেতে পারে। কাল্পনিক ও রূপকথার গল্পের প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এ সময়ে। আমার মতে, শিশুকে কমিক্স পড়ে শোনানো যায়। হালকা হাস্যরসে মন খুশি-খুশি থাকবে। আনন্দ পেলে স্নায়ুচাপ প্রশমিত হয় আর যে ব্যক্তি আনন্দ দেয় তার প্রতি শিশু কৃতজ্ঞ বোধ করে। পাশাপাশি শিশুমন আরো গল্প জানার জন্য ছটফট করতে থাকে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, শিশু এ সময়ে কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝে পার্থক্য বুঝতে শুরু করে।

৪-৫ বছরের একটি শিশু নিজে নিজে অনেক গল্প ও ঘটনা কল্পনা করে। নিজের চিন্তার পটে সেগুলোকে সত্য মনে করে। তাই ৬ বছর বয়সেই শিশুর মননে সত্য বলার গুণ গেঁথে দিন। মিথ্যার জন্য সে যে নিজেই দায়ী এবং এর ফলাফল সম্পর্কেও তাকে জানিয়ে দিন।

শিশুর মা যদি গল্পের মধ্যে ঈমান ও তাওহিদের নির্যাস ঢেলে দিতে পারেন তবে তা অতি উত্তম। মানুষের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও অনুগ্রহকে তার দৃষ্টিগোচর করতে পারাটা খুব জরুরি। তিনিই সেই মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা যাকে আমরা ভালোবাসি এবং প্রশংসা করি। আমরা তাঁরই আনুগত্য করি, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি আর তাঁর ওপরই ভরসা করি। তবে পুরো ব্যাপারটিই হতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত পন্থায়। শিশুর কাছে যেন এটাকে ধর্মীয় বক্তৃতা মনে না হয় কিংবা মনে যেন ভয় ঢুকে না যায়। বিষয়টি অবশ্যই আরো গভীর আলোচনার দাবিদার। তবে সেটা উপযুক্ত সময়ে।

বুঝতে পারার গুরুত্ব

আমরা সবাই বোঝার জন্যই পড়ি। কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আরো গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। সে যেন অবশ্যই কিছু বুঝে পড়তে পারে। শিশুর জন্য আনা বইগুলো যদি সে না পড়ে তাহলে সেগুলো তার ধারণক্ষমতার বাইরে বলে ধরে নিতে হবে। তাই সমাধান হিসেবে গল্পগুলো শিশুকে পড়ে শোনানো যেতে পারে এবং দুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।

শিশুর ধারণক্ষমতা একটু কম কিংবা নির্দিষ্ট কোনো গল্পের ক্ষেত্রে তার বোঝার সমস্যার কথা মা ধরতে পারবেন। তাই তার জন্য নিচের বয়সের বই কিনে দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ৯ বছরের বাচ্চার জন্য ৭ বছরের বাচ্চাদের বই দেওয়াই সমীচীন।

নতুন নতুন শব্দ থেকে আরেকটু কঠিন পর্যায়ে যাবার পর তার বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় তার বয়সের উপযুক্ত বই মা কিনে দিতে পারেন। এক মা লক্ষ করলেন, তার ছোট ছেলেটি গল্প বুঝতে পারছে না। তাই তাকে বোঝানোর দায়িত্ব ৩ বছরের বড় ভাইকে অর্পণ করা হলো। বড় ভাই এবার ছোট ভাইকে নিয়ে পড়তে শুরু করল এবং বিভিন্ন জায়গা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলো। কিন্তু ছোট ভাই তার ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাই সে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। কখনো কখনো ধস্তাধস্তিও শুরু হয়ে যেত (দুজনার মধ্যে)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষক হিসেবে বড় ভাইকে (নির্ধারণ করা) খুব একটা ভালো বুদ্ধি নয়।

পড়াশোনায় যদি আসে অনিয়ম

শিশুদের দুরন্ত মন, ছটফটে স্বভাব এবং কাজের ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়ার কথা আমরা সবাই জানি। লেগে থাকতে না পারার এই ইতিহাস তো বড়দেরও আছে। নিপাট বইপড়ুয়াকেও দিনের পর দিন পড়া থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়।

শিশুদের মাঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেক সময় অভিভাবকেরা চাপে পড়ে যায়। শিশুদেরকে বইপত্র ও কমিক্স কিনে দেওয়ার জন্য তারা অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু বাচ্চারা সেগুলো কয়েকদিন আগ্রহের সাথে পড়ে আবার দূরে সরিয়ে রাখে। তা দেখে পরিবারও হাল ছেড়ে দেয়, আর কোনো বই কিনে দেয় না তারা। তাদের দাবি হলো—এত এত ভালো বই থাকার পরেও বাচ্চা পড়তে চায় না। তাই তাকে আর উৎসাহ দিয়ে লাভ নেই। এমনটাই তারা ধরে নেয়। কিন্তু তাদের এ ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। শিশু যত মনোযোগী বা অমনোযোগীই হোক না কেন, তাকে সবসময় একজন বইপ্রেমী মনে করেই আচরণ করতে হবে। কারণ তাকে পড়ুয়া ধরে নিয়ে করা আচরণগুলোই তাকে একদিন পড়ুয়া বানাবে।

স্বতঃস্ফূর্তির সাথে পড়ে শোনানো

বাচ্চা আপনাকে কোনো গল্প পড়ে শোনাতে বললে, তার সে চাহিদা পূরণের আগে ব্যাপারটির সাথে অভ্যস্ত হয়ে নিন। পূর্ণ উদ্দীপনা এবং প্রস্তুতি রাখুন।

যদি নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেন, তাহলে বাচ্চার কাছ থেকে সময় চেয়ে নিন। হতে পারে তা ৫/৬ ঘণ্টা, তবে অবশ্যই সেটা ভোলা যাবে না।

প্রয়োজনে আপনার স্ত্রী বা শিশুর বড় ভাইবোনদেরও এ দায়িত্ব দিতে পারেন। কেননা ক্লান্ত বা বিরক্ত অবস্থায় পড়তে গেলে তা আকর্ষণীয় হবে না। আর এর কোনো মূল্যও থাকবে না। এতে করে শিশুর কাছে পড়ার গুরুত্ব কমে যাবে। সে মনে করতে পারে যে, সবকিছু তাকেই করে নিতে হবে।

ছোটরা ভাষণ শুনতে ভীষণ অপছন্দ করে

শুধু ছোটরা কেন, ছোট-বড় কেউই ভাষণ শুনতে পছন্দ করে না। বক্তৃতা যার ওপর ঝাড়া হয়, তার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এতে করে তারা দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে—তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে দেখে ভাষণ দেওয়া

হচ্ছে। অথবা মনে করতে পারে, বক্তা তাদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণির ও আলোচ্য বিষয়ে ভুল-ত্রুটি করা থেকে ঊর্ধ্বে। তাই যা জানাতে চাচ্ছি সেটা বিনয়, ভদ্রতা ও পরোক্ষভাবে নিশ্চিত করা জরুরি।

একজন তার ছেলেবেলার কথা এভাবে জানিয়েছেন—

৭ বছর বয়সে আমি মায়ের বলা গল্পগুলো খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার ছোট ভাই জন্ম নেবার পর মা ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তখন বাবা আমাকে গল্প পড়ে শোনানোর দায়িত্ব হাতে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অনেক আকর্ষণীয় এবং পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলতেন সবকিছু। কিন্তু প্রতিটি গল্পের শেষে আমাকে তার সারাংশ বলতে দিয়ে তিনি এক ধরনের পরীক্ষা নিতেন। জবাবে আমি বলতাম যে, ঠিকমতো খেয়াল করিনি। আমি হয়তো খালার বাড়িতে বেড়ানোর ঘটনা এবং খালাতো ভাইয়ের নতুন গেমসের কথা ভাবছিলাম মনে মনে। আমার ব্যাখ্যা খারাপ ছিল বলে স্বীকার করে নিতাম। তখন তিনি বলতেন, 'পরের বার মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু। নাহলে আমি আর তোমাকে পড়ে শোনাব না।' এক কি দুই বছর পরে বাবা বললেন, 'এই গল্পটা পড়ো। শেষ হলে আমাকে জানাবে।' মাগরিবের পর আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম। যাবার সাথে সাথেই তিনি যেন হিসাব নেওয়া শুরু করলেন, 'এই গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?' আমি একটু আঘাতপ্রাপ্ত হলাম। কারণ গল্পটি খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না। হয়তো সেটি আমার ধারণক্ষমতার বাইরে হওয়ায় তা বুঝতে পারিনি। সেখান থেকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন তো অনেক পরের ব্যাপার। কিন্তু বাবা রাগতঃস্বরে বললেন, 'তুমি এগুলোকে যেনতেনভাবে নিচ্ছ। আহমাদ বয়সে ছোট, অথচ তোমার চেয়ে ওর মধ্যে শেখার আগ্রহ অনেক বেশি।' সেদিন থেকে বইপত্রের সাথে আমার দূরত্ব বাড়তে থাকে। কারণ তা হাতে নেবার সাথে সাথে বাবার অপমানের কথা মনে পড়ে। নিজেকে তাই বলতাম, 'স্কুলে ভালো করাই যথেষ্ট। বইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক কেমন, তা শিক্ষকরা যাচাই করবেন; বাবা নন। তারা সহজ সহজ প্রশ্ন করেন, কাউকে তিরস্কার করেন না!'

পরামর্শ, আনন্দ এবং আগ্রহ সৃষ্টিকারী পন্থা সবসময়ই প্রিয় আর কার্যকরী। এজন্য বেশিরভাগ শিশু বিদেশি বইগুলোর প্রতি বেশি ঝোঁকে। কারণ, এগুলোর মধ্যে সুন্দর, রং-বেরঙের ছবি থাকে এবং পাঠককে একগাদা উপদেশ ও ভাষণ শুনতে হয় না।

টিভি আর ইউটিউব বইয়ের শত্রু

ছোটরা বা বড়রা কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হবার মানে এই নয় যে, সেগুলো সর্বোত্তম কিংবা উপকারী কিছু। সত্যি বলতে কি, উপকারী জিনিসগুলো কিন্তু চোখের দেখায় ঝলমলে মনে হয় না কিংবা এর শ্রেষ্ঠত্বও চট করে বোঝা যায় না। অতি উৎসাহ বা মোহাচ্ছন্নতা থেকে মানুষ অনেক কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অথবা ক্ষণিক আনন্দ থেকে উৎসারিত আনুগত্য বোধও এর কারণ হতে পারে। নিজের প্রয়োজন এবং কেবল যোগাযোগের তাড়না থেকেই শিশুর একটি যোগাযোগমাধ্যম দরকার। কিন্তু ইউটিউব বা টিভি দেখার কারণ এটি নয় যে, তা মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে ভালো। হ্যাঁ, চিত্তাকর্ষক কার্টুন এবং প্রাণবন্ত বিষয়বস্তু দ্বারা মনোরঞ্জন হয়, যেগুলো পড়ার মাঝে নেই। পড়ার জন্য চাই মনোযোগ, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং বোঝার প্রচেষ্টা। একটি চমৎকার গল্প মানুষের মনে সীমাহীন আনন্দ এবং অদ্ভুত ধরনের সন্তুষ্টি তৈরি করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কিশোর বয়সি কিংবা এর ওপরের স্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৯ বছরের বাচ্চার কাছে ভিডিও গেমস, টিভি, ইউটিউবের চেয়েও চমৎকার গল্প বেশি আকর্ষণীয় এবং জোরদার মনে হয়।

সচেতন অভিভাবকেরা ইতোমধ্যেই ওপরের কথাগুলো বুঝে গিয়েছেন। সমাধান হিসেবে তারা বাচ্চাদের টিভি-ইউটিউব দেখা ও গেমস খেলার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেন। ৭ বছরের বাচ্চার ক্ষেত্রে টিভি ও গেমস খেলার জন্য এক ঘণ্টা করে সময় বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। তবে বাচ্চার বয়স আরো বেশি হলে সময়ও আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়। শিশু যখন বুঝে যাবে যে, এই বিনোদন কেবল নির্ধারিত সময়ের জন্য, তখন সে বাকি সময়টা পড়া, ছবি আঁকা এবং অন্যান্য সৃজনশীল কাজে ব্যয় করবে। এটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত। আবার অনেক অভিভাবক সপ্তাহে টানা দুদিন টিভি বন্ধ রাখে যাতে বাচ্চারা এর মাঝে ডুবে না যায়। এর ফলাফলও খুব ইতিবাচক। বাচ্চাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করায় স্বাভাবিকভাবেই তারা অভিযোগ এবং উৎপীড়ন করবে। তবে সময়ের সাথে সাথে সব আবার মানিয়েও নেবে। গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর দৃঢ় থাকা এবং পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ধরে রাখাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বাচ্চাদের ঘরে টিভি না রাখা হলো ওপরে বলা সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নয়তো দুটো মন্দ জিনিস ঘটার আশঙ্কা আছে—**এক.** বাচ্চারা টিভির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। **দুই.** টিভি দেখার সময় নির্ধারণ করা নিয়ে বিপত্তি ঘটতে পারে।

অস্থিরতা এবং পড়াশোনা

অনেক অভিভাবকের অভিযোগ থাকে, শিশুরা এক মিনিটের বেশি কোথাও স্থির থাকতে পারে না। কোনো কিছুতে তাদের মনোযোগ দু-তিন মিনিটের বেশি থাকে না। এজন্য অভিভাবকদের প্রশ্ন, 'এরকম শিশু কীভাবে আধা ঘণ্টা বা তারও অর্ধেক সময় একটি গল্প বা কমিকস পড়ে ব্যয় করতে পারে?'

অস্থিরতা কিংবা ADHD অনেক পরিবারেই একটি সাধারণ সমস্যা। কোনো কোনো সমাজে অস্থিরতা এবং মনোযোগের ঘাটতিতে ভোগা শিশুর হার ৫ %। আর শুধু অস্থিরতার হার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৫ %। তবে অবশ্যই অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব এবং চেষ্টার অবকাশ রয়েছে।

অনেক শিশুই অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু এর ফলে এমন কোনো সমস্যা তৈরি হয় না যা কিনা চিকিৎসার দ্বারা সমাধান করতে হয়। বাচ্চার বয়স ৭-৮ বছর হলে এমনিই সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে সবকিছু ধৈর্য এবং যত্নের সাথে করা চাই।

একজন মা বলেন, 'আমার মেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখত এবং তার চারপাশে কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা চালাত। কিন্তু দেখা গেল আসলে সে কিছু ধরতে পারছে না। ধারাবাহিকভাবে কোনো কিছু করাও তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছিল। এরপর আমি তার মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য চেষ্টা চালালাম। আর এজন্য আমি ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সাথে তাকে পড়ার দিকে ধাবিত করার জন্য মাঠে নামলাম। প্রথমে কোনো একটি বিষয় সবিস্তারে তাকে পড়ে শোনাতাম এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম। নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার মেয়ে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অধিক উৎসাহ নিয়ে কোন জিনিসটি পড়ে?' এবার আমি অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেলাম। আবিষ্কার করলাম, মজার মজার ছড়া এবং হাস্যরসে ভরা গল্পগুলো পড়ার ব্যাপারে সে বেশি মনোযোগী। এগুলো ৬-৭ মিনিটের মতো তার মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম ছিল। তাই আমি প্রতি ১৫ দিন পরপর তাকে এরকম বই এনে দিতাম, আর সে মনোযোগ সহকারে তা পড়ে ফেলত।

এরপর খাবার খাওয়ার সময় তার পড়া সবচেয়ে হাসির কিছু গল্প শোনাতে বলতাম। তার বর্ণনা শুনে আমরা মনখুলে হাসতাম। আমি বলতাম, 'তুমি আমাদের ঘরের সবচেয়ে ভালো মেয়ে। কারণ তুমি আমাদের সবাইকে আনন্দ দাও।' এর ফলে তার পড়ার প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। এরপর আমি তাকে এমন কিছু বই এনে

দিলাম যেগুলো হাস্যরসাত্মক ছিল না। তবে সে ওগুলো পড়ল এবং আমাদেরকে খুশি করার জন্য সারমর্মও উদ্ধার করল। এরপর এমন একটা সময় এলো যখন আমরা একসাথে দেড়শো পৃষ্ঠার বই কেনা শুরু করলাম। আর আমার মেয়ে সেগুলোও গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

সে এখন বিজ্ঞানের ছাত্রী এবং শরিয়াহ ও সাহিত্যেও তার বেশ ভালো দখল রয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তার মনোযোগ এদিক-ওদিক ঘোরা বাদ দিয়ে বইয়ের সাথে লেগে গেছে। এখন সে বইয়ের পর বই পড়ে যায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও নাম লেখায়। বর্তমানে সে 'পারিবারিক বিচ্ছেদ' প্রসঙ্গে ছোটখাটো একটি গবেষণাপত্র লিখছে!'

কাজেই মমতা, ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম আর ধারাবাহিক চেষ্টার দ্বারা তা-ই অর্জন করা সম্ভব যা অর্জন করা উচিত।

শিশুদের সাথে সত্যবাদিতা

সন্তানদের অধিক সফল হতে দেখলে বাবা-মা খুশি হন। তাই সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে তারা নাগালে থাকা সকল পন্থাই অনুসরণ করেন। এজন্য অনেক অভিভাবক নিজেদের বিশাল বিশাল অর্জন, সাহসিকতা, অনন্যতা তুলে ধরেন এবং স্কুলের অবাক করা ফলাফল ও পড়ার প্রতি একাগ্রচিত্ততা বর্ণনা করে থাকেন। কেউ কেউ আবার এক্ষেত্রে কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সত্য-মিথ্যার সীমা অতিক্রম করে চলে যান।

আট বছর বয়সে বাবা কী পরিমাণ বইপাগল ছিলেন কিংবা কীভাবে একজন মানুষ বই না পড়ে থাকতে পারে, পড়া ও জ্ঞানার্জন ছাড়া জীবন অর্থহীন ইত্যাদি নিয়ে অবাক হওয়ার ভান করা গালগল্প শোনানো হয়! উদ্দেশ্য হলো বাচ্চাদেরকে মুগ্ধ করা। কিন্তু এতে করে অভিভাবকেরা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছেন। কারণ সত্য যত অপ্রীতিকরই হোক না কেন, সেটাই একমাত্র পন্থা। বড় হবার এক পর্যায়ে বাচ্চারা আবিষ্কার করবে যে তাদের বাবা-মা আসলে অনেক ব্যাপারেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ ধরনের মিথ্যাচারের ফলে একটি ভয়ানক সংকট তৈরি হবে পরিবারে। ভরসা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটা খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সত্যিটা হলো অভিভাবকদের একটা বিরাট অংশ পড়তে ভালোবাসেন না। বাচ্চাদেরকে পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে যা করা দরকার, সেই দায়িত্বও পালন করেন না। এমন বাবা খুঁজে পাওয়া কঠিন যিনি কিনা টিভি দেখা, ঘুমানো বা বন্ধুদের সাথে আড্ডা না দিয়ে বইপড়াকে বেশি প্রাধান্য দেন। বেশিরভাগ পরিবারেরই আজ এই অবস্থা। এক বাবার ঘটনা বলছি। তিনি তার সন্তানদেরকে বলতেন, 'ছেলেবেলায় আমি বই-পুস্তকের প্রতি তেমন একটা গুরুত্ব দিতাম না। এসব আমার ভালো লাগত না, আকর্ষণ ছিল না বললেই চলে। ছোট থাকতে এ কারণেই কোনো ক্লাসে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর সব পাল্টে গেল। তোমাদের দাদা আমাকে একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন এবং আমার পড়াশোনার জন্য দেদারসে খরচ করলেন। তাই ভার্সিটি-লাইফে আমি পড়ার প্রতি এতটাই আগ্রহী হয়ে উঠলাম যে, বইপড়াটা একরকম আমার নেশায় পরিণত হলো। সহপাঠীদের পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার আনন্দ আমি উপভোগ করতে লাগলাম।'

পড়ার ধরন যেমন হবে

বাচ্চাদের আমরা যেসব গল্প বলি, পড়ে শোনাই বা তারা নিজেরা যা পড়ে সেগুলোর মাঝে মোটাদাগে 'উৎকর্ষ' আর 'আনন্দ' থাকা চাই। বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল দিক থেকে শিশু বেড়ে ওঠে। তাই পড়ার বিষয়বস্তু উৎকর্ষ মানের হওয়া চাই। চিন্তা করার জন্য আমরা তাকে কী ধরনের জ্ঞান দিচ্ছি সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হতে হবে। পড়ার ভেতর আনন্দ থাকাও সমানতালে জরুরি। কারণ বিষয়বস্তু আনন্দদায়ক না হলে তারা কিছু পড়তে বা শুনতে চাইবে না। শৈশবের প্রাথমিক এবং মাঝামাঝি পর্যায়ের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ এক্ষেত্রে শিশু বইমুখী হবে না। তার সখ্যতা গড়ে উঠবে না বইয়ের সাথে। এছাড়া তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও আনন্দের প্রয়োজন আছে। এভাবে তারা জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে শিখবে। তাই তাদেরকে যেসব বই পড়তে দেবো কিংবা তারা যেগুলো পড়বে সে ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। উপযুক্ত বইয়ের ধরন সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—

» শিশুর জন্য উপযুক্ত বই প্রয়োজন। অর্থাৎ সুন্দর ও কোমল ভাষায় রচিত বই এবং গল্প বাছাই করতে হবে। বইয়ের গায়ে কী লেখা তা দেখে নিন। সেখানে বইটি কাদের জন্য উপযুক্ত তা লেখা থাকে।

» রহস্য আর রোমাঞ্চকর গল্প বাছাই করা যেতে পারে। বাচ্চাদের জন্য লিখতে হলে অনেকগুলো প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বই পড়তে গিয়ে শিশু নাওয়া-খাওয়া সব কথা ভুলে যাবে—এমন গল্প সবাই লিখতে পারে না। বইয়ের বিক্রি-সংখ্যা, কতগুলো ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে, এসবের ওপর ভিত্তি করে বোঝা যাবে গল্পটা কতটুকু প্রকৃষ্ট আর বাচ্চারাই বা এর প্রতি কত বেশি আকৃষ্ট। কারণ সব শিশুই এক। চীনের কোনো বাচ্চাকে যে জিনিসটা আকৃষ্ট করবে, ওই একই জিনিস দিয়ে প্যারিস আর দক্ষিণ আফ্রিকার শিশুটিকেও আকৃষ্ট করা যাবে।

» শিশুমনে ত্রাস সৃষ্টি হয় কিংবা ভয়ের উদ্রেক ঘটায়, এ ধরনের গল্প পরিহার করতে হবে। জিন-ভূত, ডাইনি, প্রেতাত্মা ইত্যাদির গল্প কখনোই বলা যাবে না। কুখ্যাত অপরাধী, বাবা-মাকে হারিয়ে ফেলা কিংবা কঠিন কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতার গল্প তাকে শোনানো ঠিক হবে না। একজন বাচ্চা হয়তো গল্প আর বাস্তবতার পার্থক্য বুঝতে পারবে না। কল্পনা ও সত্যকে সে মিলিয়ে ফেলতে পারে। গল্পের চরিত্রগুলোর মতো পরিণতি তারও হতে পারে, এটা ভেবে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

» ইসলাম সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখে এমন মুসলিম কিংবা কাফির লেখকের বই সামনে চলে আসতে পারে। অনূদিত বইগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটা দেখা যায়। তাদের লেখায় এমন কিছু থাকাটা খুবই স্বাভাবিক যা তাওহিদের বিপরীত কিংবা ইসলামের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। অভিভাবকদের (এসব বইপত্রের ব্যাপারে) সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

» শিশুর ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ আচরণ গঠনে সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলে তার শৈশবে পড়া বইপত্র।

কাজেই আমাদের উচিত তাদেরকে এমন সব গল্প বলা, যাতে করে তাদের মনের ভেতর তাওহিদের বিশ্বাস গেঁথে যায়। অন্তরে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়। কারণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর প্রশংসা করা হলো মুসলিম-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, রীতিনীতি এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ-সমৃদ্ধ কিছু বই তুলে দিতে হবে শিশুর হাতে। সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, দানশীলতা, উদারতা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, সচেতনতা এবং নৈতিক